আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসমাতুল আম্বিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাত ও ইমামাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৭. সুন্নাত ও বিদ‘আত

এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন: ‘‘মোজাদ্বয়ের উপর মাস্হ করা (মোছা) সুন্নাত। এবং রামাদান মাসের রাত্রিগুলোতে তারাবীহ সুন্নাত।’’

ইমাম আযমের এ বক্তব্যটি অনুধাবনের জন্য সুন্নাত পরিভাষাটি প্রথমে বুঝতে হবে। এরপর এ বিষয়টি আকীদা প্রসঙ্গে উল্লেখের কারণ ও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

সুন্নাত শব্দের অর্থ বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘‘এহইয়াউস সুনান’’ গ্রন্থে। এখানে অতি-সংক্ষেপে বলা যায় যে, আভিধানিকভাবে সুন্নাত অর্থ ছবি, কর্মধারা, জীবনপদ্ধতি বা রীতি। ইসলামী শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। সুন্নাতের দুটি অর্থ প্রচলিত। এক অর্থে সুন্নাত ফরয-ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের ইবাদত। সুন্নাতের দ্বিতীয় অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রীতি ও পদ্ধতি। হাদীসে ‘সুন্নাত’ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কাজ করেননি- অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত। যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করা। এক কথায় কর্মে ও বর্জনে, গুরুত্বে ও পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুকরণই সুন্নাত। সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দু-প্রজন্মের কর্ম ও বর্জনও সুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত।[1]

কথায়, কর্মে, বর্জনে, গুরুত্বে বা পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যতিক্রম করা ‘‘খিলাফে সুন্নাত’’ বা ‘‘সুন্নাতের ব্যতিক্রম’’। তিনি যা করেছেন তা না করা অথবা তিনি যা করেননি তা করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম (খিলাফে সুন্নাত)। সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা সুন্নাত বিরোধী কর্ম বৈধ হতে পারে, কিন্তু দীন হতে পারে না। তিনি যা করেছেন তা বর্জন করা এবং তিনি যা করেননি তা করা শরীয়তের অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, তবে কখনোই তা দীনের অংশ হতে পারে না।

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো আকীদা বা কর্মকে দীনের অংশ মনে করাকে বিদ‘আত বলে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বিদআতের উদ্ভাবন হয়। আল্লাহ বলেন:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

‘‘কিন্তু সন্ন্যাসবাদ- তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।’’[2]

হাদীসে ইসলামের মধ্যে যে কোনো প্রকার উদ্ভাবন বা নতুন বিষয় প্রবেশ করানোকে ‘‘বিদ‘আত’’ (নব-উদ্ভাবন), ‘‘ইহদাস’’ (নতুন বানানো), ‘‘সুন্নাত অপছন্দ’’ ও ‘‘নিজ পছন্দের অনুসরণ’’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বিদ‘আতকে সকল বিভ্রান্তির মূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বারংবার বিদ‘আত ও বিদআতে লিপ্ত মানুষদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরআন, সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো বিষয়কে দীন বা আকীদার অন্তর্ভূক্ত করাকেই ইমাম আবূ হানীফা বিদআত বলে গণ্য করেছেন। আমরা দেখেছি, তিনি বলেছেন: ‘‘বিষয় তো শুধু তাই যা কুরআন নিয়ে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যার দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানুষদের দল-ফিরকায় বিভক্ত হওয়ার আগে তাঁর সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন। এগুলো ছাড়া যা কিছু আছে সবই নব-উদ্ভাবিত বিদআত।’’ এ বিষয়ে ‘‘আল-ফিকহুল আবসাত’’ গ্রন্থে তিনি বলেন:

حَدَّثَنِيْ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِيْ الإِسْلاَمِ فَقَدْ هَلَكَ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَقَدْ ضَلَّ وَمَنْ ضَلَّ فَفِيْ النَّارِ ... وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ شَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ.

‘‘আমাকে হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে ইবন মাসঊদ (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করবে সে ধ্বংস হবে। আর যে কোনো বিদ‘আত উদ্ভাবন করবে সে বিভ্রান্ত হবে। আর যে বিভ্রান্ত হবে সে জাহান্নামী হবে।... আর আমাকে হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে, ইবন মাসঊদ (রা) থেকে, তিনি বলতেন: নিশ্চয় কাজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নতুন উদ্ভাবিত কাজ, প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজই বিদ‘আত, প্রত্যেক বিদ‘আতই বিভ্রান্তি এবং প্রত্যেক বিভ্রান্তিই জাহান্নামী।’’[3]

এভাবে আমরা দেখছি, যে কর্ম বা বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দীন বা ইবাদত হিসেবে পালন করেননি তাকে দীন, ইবাদত বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ‘আত। এখানে বিদআতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বিস্তারিত জানতে পাঠককে ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(ক) বিদআত একান্তই ধার্মিকদের পাপ। ধার্মিক ছাড়া কেউ বিদআতে লিপ্ত হয় না। বিদআতই একমাত্র পাপ যা মানুষ পুণ্য মনে করে পালন করে।

(খ) কোনো কর্ম বিদআত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত তাকে ইবাদত মনে করা। যেমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নর্তনকুর্দন করে যিকর বা দরুদ-সালাম পড়ছেন। এরূপ দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন শরীয়তে মূলত নিষিদ্ধ নয়। কেউ যদি জাগতিক কারণে এরূপ করেন তা পাপ নয়। দাঁড়ানো বা নর্তন কুর্দনের সময় যিকর বা দরুদ-সালাম পাঠ পাপ নয়। দরুদ-সালাম বা যিকরের সময় কোনো কারণে বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগে দাঁড়ানো বা লাফানো পাপ নয়। কিন্তু যখন কেউ ‘দাঁড়ানো’, ‘লাফানো’ বা ‘নর্তন-কুর্দন’-কে দীন, ইবাদত বা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিশ্বাস করেন তখন তা বিদআতে পরিণত হয়। ইবাদত মনে করার অর্থ: (১) যিকর বা দরুদ-সালাম দাঁড়ানো বা লাফানো ব্যতিরেকে পালন করার চেয়ে দাঁড়ানো বা লাফানো-সহ পালন করা উত্তম, অধিক আদব, অধিক সাওয়াব বা অধিক বরকত বলে মনে করা বা (২) দাঁড়ানো বা লাফানো ছাড়া যিকর বা দরুদ-সালাম পালন করতে অস্বস্তি অনুভব করার কারণে এপদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনকে রীতিতে পরিণত কর।

(গ) হাদীস শরীফে বিদআতের কয়েকটি পরিণতির কথা বলা হয়েছে: (১) তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ এ কর্ম আল্লাহ কবুল করছেন না এবং এজন্য কোনো সাওয়াব হচ্ছে না। (২) তা বিভ্রান্তি। কারণ তিনি জেনে বা না-জেনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের ইবাদতকে অপূর্ণ বলে মনে করছেন। (৩) বিদআত অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। (৪) বিদআতে সুন্নাত অপছন্দ ও সুন্নাতের মৃত্যু।

(ঘ) বিদআতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বা আহলূস সুন্নাত মনে করেন। যে সুন্নাতগুলো তার বিদআতের প্রতিপক্ষ নয় সেগুলি তিনি পালন বা মহববত করেন। তবে তাঁর পালিত বিদআত সংশ্লিষ্ট সুন্নাতকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। উপরের উদাহরণটি বিবেচনা করুন। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করছেন তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি কোথাও দেখেন নি। তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ বসেবসে যিকর, দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন বলে তিনি অনেক হাদীস থেকে জেনেছেন। তারপরও তিনি বসে যিকর বা দরুদ-সালাম পালনে অস্বস্তিবোধ করবেন। বিভিন্ন 'দলীল' দিয়ে এ সকল ইবাদত বসে পালনের চেয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে পালন করা উত্তম বলে প্রমাণের চেষ্টা করবেন।

তার বিদআতকে প্রমাণ করতে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক দলীল পেশ করবেন এবং সুন্নাত-প্রমাণিত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে তিনি বলবেন: 'সবকিছু কি সুন্নাত মত হয়? ফ্যান, মাইক... কত কিছুই তো নতুন। ইবাদতটি একটু নতুন পদ্ধতিকে করলে সমস্যা কী? উপরন্তু সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে বসেবসে দরুদ, সালাম ও যিকর পালনকারীর প্রতি কম বা বেশি অবজ্ঞা অনুভব করবেন।

(ঙ) তাওহীদের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে শিরকের উৎপত্তি এবং রিসালাতের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে বিদআতের উৎপত্তি। বিদআত মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা রিসালাতের পূর্ণতায় অনাস্থা। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'গাইরুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া অন্য)-এর প্রতি হৃদয়ের আস্থা অধিক অনুভব করেন তেমনি বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতের ক্ষেত্রে 'গাইরুন্নবী' (নবী ছাড়া অন্য)-এর অনুসরণ-অনুকরণে অধিক স্বস্তি বোধ করেন। তিনি সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'সব কিছু কি নবীর তরীকায় হয়?' বলে এবং নানাবিধ 'দলীল' দিয়ে ইত্তিবায়ে রাসূল ﷺ গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। পাশাপাশি তার 'বিদআত' আমল বা পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করতে 'গাইরুন্নবী' অর্থাৎ বিভিন্ন বুজুর্গের কর্মের প্রমাণ প্রদান করেন।

(চ) সকল পাপের ক্ষেত্রে মুমিন জানেন যে তিনি পাপ করছেন; ফলে তাওবার একটি সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদআত পালনকারী তার বিদআতকে নেক আমল মনে করেই পালন করেন। কাজেই এর জন্য তাওবার কথা তিনি কল্পনাও করেন না। এজন্য শয়তান বিদআতকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

(ছ) বিদআতের অন্য অপরাধ তা সুন্নাত হত্যা করে। সুন্নাত বহির্ভূত কোনো কর্ম বা পদ্ধতি ইবাদতে পরিণত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসনূন ইবাদত বা পদ্ধতির মৃত্যু। যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পাঠ উত্তম বলে গণ্য করছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে বসে যিকর বা সালাম তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। সমাজের অন্যান্য মানুষেরা যখন এভাবে ইবাদতটি পালন করতে থাকবেন তখন সমাজ থেকেও সুন্নাতটি অপসারিত হবে।

(জ) বিদ‘আত ‘‘সুন্নাতের খিলাফ’’ হলেও, ‘‘দলীলের খিলাফ’’ নয়। সকল বিদ‘আতই ‘‘দলীল’’ নির্ভর। কুরআন-হাদীসের দলীল ছাড়া কোনো বিদ‘আত উদ্ভাবিত হয় না। দলীল ছাড়া যা উদ্ভাবন করা হয় তা দীন বলে আখ্যায়িত করার সুযোগ থাকে না। ‘দলীল’ নামের কোনো কিছু থাকলেই শুধু সুন্নাহ বিরোধী কোনো আকীদা বা আমলকে ‘দীন’-এর অংশ বানানো যায়। আল্লামা ইবন নুজাইম (৭৯০ হি) বলেন:

الْبِدْعَةِ ... اسْمٌ مِنْ ابْتَدَعَ الأَمْرَ إذَا ابْتَدَأَهُ وَأَحْدَثَهُ ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى مَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّينِ أَوْ نُقْصَانٌ مِنْهُ. وَعَرَّفَهَا الشُّمُنِّيُّ بِأَنَّهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلافِ الْحَقِّ الْمُتَلَقَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ حَالٍ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ وَجُعِلَ دِينًا قَوِيمًا وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

‘‘বিদ‘আত শব্দটি... ‘ইবতাদ‘আ’ ফি’ল থেকে গৃহীত ইসম। এর অর্থ শুরু করা বা উদ্ভাবন করা। অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ‘আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে।’ শুমুন্নী বিদ‘আতের সংজ্ঞায় বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং ‘মুসতাহসান’ বা ভাল মনে করে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে মুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ‘আত’।’’[4]

এজন্য আমরা দেখি যে, সকল বিভ্রান্ত দলই কুরআন-হাদীস থেকে দলীল প্রদান করে, তবে তারা সুন্নাত প্রদান করতে পারে না। এ সকল দলীল দিয়ে তারা এমন একটি কথা বা কর্ম দীনের অংশ বলে দাবি করে, যা কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি বা করেননি। ইতোপূর্বে বিভ্রান্ত গোষ্ঠীদের আকীদায় আমরা তা দেখেছি। দু-একটি বিষয় পর্যালোচনা করা যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে ‘‘কোনো কিছুই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়’’। কিন্তু কোথাও বলা হয় নি যে, আল্লাহ কথা বলেন বিশ্বাস করলে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। এ ছাড়া কোথাও বলা হয় নি যে, কুরআন সৃষ্ট। মুতাযিলীগণ কুরাআনের ‘‘দলীল’’ দিয়ে এমন একটি মত উদ্ভাবন করে যা কখনোই কুরআন-হাদীসে বলা হয় নি। এরপর তারা এ উদ্ভাবিত মতটিকে দীনের অংশ বানিয়ে নেয়। কেউ যদি কুরআনের কথাগুলি হুবহু বিশ্বাস করেন এবং শতকোটিবার স্বীকার করেন তবুও তারা তাকে মুমিন বলে স্বীকার করতে রাযি হয় নি; যতক্ষণ না যে তাদের উদ্ভাবিত কথাটি স্বীকার করতো।

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

‘‘আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন; যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।’’[5]

মুতাযিলীগণ দাবি করত যে, ‘‘বানানো’’ অর্থই সৃষ্টি করা; কাজেই কুরআন সৃষ্ট। তাদের এ দলীল ভিত্তিহীন। (جعل) বা বানানো অর্থ কখনো ‘‘সৃষ্টি’’ করা হতে পারে, তবে এর মূল অর্থ একটি বিশেষ রূপ দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর কালাম কুরআনকে আরবীরূপে প্রকাশ করেছেন। যেমন আল্লাহ হস্তীবাহিনীর বিষয়ে বলেছেন:

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

“তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার মত বানালেন।”[6]

এর অর্থ এ নয় যে, তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায় সৃষ্টি করেছিলেন, বরং তিনি তাদেরকে ভক্ষিত শস্যপাতার রূপ দিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় যে, মুতাযিলীগণ তাদের উদ্ভাবিত অর্থকেই দীন বানিয়ে নেয়। “আল্লাহ কুরআনকে আরবীতে সৃষ্টি করেছেন”- এ কথাটি বলা ও বিশ্বাস করাকে তারা দীন মনে করেছে; কাজেই কেউ যদি শতকোটিবার বলেন যে, “আল্লাহ কুরআনকে আরবী বানিয়েছেন” কিন্তু তাদের উদ্ভাবিত কথাটি না বলে তবে তাকে মুমিন বা প্রকৃত মুমিন বলে মানতে রাযি হয় নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আলী (রা) ও আলী-বংশের ইমামগণের গাইবী ইলম ও ক্ষমতা সম্পর্কে শীয়াগণের আকীদাও অনুরূপ। “ইমামগণ” বিষয়ে অতিভক্তিই শীয়াগণের মূল প্রেরণা। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বাদ দিয়ে তো আর তাঁদেরকে ‘আলিমুল গাইব’ বানানো যায় না। তাই তারা তাঁদের সকলের জন্য সামগ্রিক ইলম গাইব এবং ইমামগণের অনুসারী “ওলী” বা খলীফাগণের জন্য আংশিক ইলম গাইব দাবী করেন। শীয়াগণের প্রভাবে মূলধারার অনুসারী অনেক মুসলিম আলিম ও সাধারণ মানুষও পরবর্তী যুগে এ ধরনের আকীদা গ্রহণ করেছেন। তাদের এ আকীদা “উদ্ভাবিত”; কারণ এ বিষয়ে তারা যা বলেন তা কখনোই এভাবে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্যের বিশেষ ব্যাখ্যা এবং অগণিত বানোয়াট কথা, গল্প ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তারা এরূপ আকীদা উদ্ভাবন করেন। ‘ইসলামী আকীদা’ ও ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থদ্বয়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কুরআন-হাদীসে বারবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না, একমাত্র আল্লাহই আলিমুল গাইব, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও অন্যান্য নবী-রাসূল গাইব জানতেন না, কিয়ামতের দিন তাঁরা সকলে একত্রিতভাবে এ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এর বিপরীতে কোথাও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা অন্য কেউ “গাইবের জ্ঞানী” বা “আলিমুল গাইব”। তবে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে ‘গাইবের সংবাদ’ জানিয়েছেন, অতীত-ভবিষ্যতের ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াদি তাঁকে জানিয়েছেন। শীয়াগণ ও তাদের অনুসারীগণ ‘গাইবের অনেক সংবাদ জানানো’-কে “গাইবের সকল জ্ঞান প্রদান” অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থহীন অগণিত বক্তব্য বাতিল করেছেন। সর্বোপরি তারা তাদের “উদ্ভাবিত” ব্যাখ্যাকে “দীন” বানিয়েছেন। কেউ যদি কুরআন-হাদীসের এ বিষয়ক সকল নির্দেশ সরল অর্থে বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের “উদ্ভাবিত” ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে তবে তারা তাকে ‘মুমিন’ বা ‘খাঁটি মুমিন’ মানতে রাজি নন।

মহান আল্লাহ কুরআনে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে শাহিদ/শাহীদ (شاهد/ شهيد) বলে উল্লেখ করেছেন।[7] এর অর্থ প্রমাণ, সাক্ষী বা উপস্থিত। এ জাতীয় আয়াত দিয়ে তাঁরা দাবি করেন যে, তিনি সদাসর্বদা উম্মাতের প্রত্যেকের নিকট “হাযির” বা উপস্থিত, “প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী”, সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং সকল গাইবের কথা জানেন।

এখানেও মুতাযিলীদের পদ্ধতি লক্ষণীয়। শাহিদ বা শাহীদ শব্দদ্বয় কখনো “উপস্থিত” অর্থে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ সময় প্রমাণ বা সাক্ষী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে বারবার সকল মুমিনকে মানব জাতির জন্য “শাহীদ” বলা হয়েছে[8]; এতে প্রমাণিত হয় না যে, সকল মুমিন ‘আলিমুল গাইব’ বা “সদা-সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত”

ও ‘‘প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী’’। যদি কেউ বিশ্বাস ও স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহিদ ও শাহীদ, কিন্তু তিনি তাদের বিশেষ অর্থটি স্বীকার না করেন তাহলে তারা তাকে ‘মুমিন’ বা ‘পূর্ণ মুমিন’ বলে মানতে রাযি নন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ফাতিমা (রা), আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ ‘‘নূর’’ দ্বারা সৃষ্ট ছিলেন বলে শীয়াগণের আকীদাও অনুরূপ। পরবর্তীতে সাধারণ ‘‘অ-শীয়া’’ মুসলিম সমাজেও এ আকীদা অনুপ্রবেশ করে। শীয়াগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস তৈরি ও প্রচার করে।[9] এগুলোই তাদের ‘‘আকীদা’’-র মূল ভিত্তি। পাশাপাশি তারা কুরআনের কিছু বাণীর কথিত ‘‘তাফসীর’’-কে দীনের অংশ বানিয়ে নেয়। যেমন, আল্লাহ বলেন:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ

‘‘আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে, যা দিয়ে হেদায়ত করেন আল্লাহ যে তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তাকে শান্তির পথে...।’’[10]

দ্বিতীয় আয়াতে ‘‘যা দিয়ে’’ বাক্যাংশে একবচনের ব্যবহার থেকে সুস্পষ্ট যে নূর ও কিতাব বলতে একটিই বিষয় বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল-কুরআন। এ ছাড়া কুরআনে অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, কুরআনই নূর যা দিয়ে আল্লাহ মানুষদেরকে হেদায়াত করেন।[11] এরপরও কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে নূর অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ)।[12]

শীয়াগণ তাদের পদ্ধতিতে মানবীয় তাফসীরকে ওহীর মান প্রদান করেন। এরপর এ তাফসীরের আবার ‘তাফসীর’ করে বলেন: মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নূর বলার অর্থ তিনি নূরের তৈরি। এরপর এরূপ ‘তাফসীরের তাফসীরকে’ তারা আকীদার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি যদি কেউ বলেন যে, আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নূর বলে মানি, তবে নূরের তৈরি বলে মানি না, কারণ কুরআনে বা তাফসীরে তা বলা হয় নি, তবুও তারা তাকে মুমিন বা প্রকৃত মুমিন বলে মানতে রাজি নন।

সর্বোপরি তারা আল্লাহর সত্তা বা বিশেষণকে সৃষ্টিজগতের নূর বা আলোর মত কল্পনা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর বংশধরকে আল্লাহর সত্তা বা বিশেষণের অংশ বলে বিশ্বাস করেন; ঠিক যেভাবে খৃস্টানগণ তাদের মূল আকীদা নাইসীন ক্রীড (Nicene creed)-এ ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সত্তা থেকে সৃষ্ট ((of the same substance/ substance of the Father) ও নূরের তৈরি নূর (light of light) বলে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও ইমামগণের বা ওলীগণের গাইবী ও অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ক তাদের আকীদাও এভাবে উদ্ভাবিত বিদআত। আল্লাহর সিফাত, তাকদীর, তাকফীর, সাহাবীগণ, আহলু বাইত ইত্যাদি বিষয়ে জাহমী, মুতাযিলী, শীয়া, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আকীদা সবই এরূপ ‘উদ্ভাবিত’ বা বিদআত আকীদা।

ফুটনোট

[1] বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ২৯-১১৪।

[2] সূরা (৫৭) হাদীদ: ২৭ আয়াত।

[3] ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৫৩।

[4] ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক শারহু কান্যুদ-দাকাইক ১/৬১১।

[5] সূরা (৪৩) যুখরুফ: ৩ আয়াত।

[6] সূরা (১০৫) ফীল: ৫ আয়াত।

[7] দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ১৪৩ আয়াত; সূরা (৪) নিসা: ৪১ আয়াত; সূরা (১৬) নাহল: ৮৯ আয়াত; সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত; সূরা (৩৩) আহযাব: ৪৫ আয়াত; সূরা (৪৮) ফাতহ: ৮ আয়াত; সূরা (৭৩) মুযযাম্মিল: ১৫ আয়াত।

[8] দেখুন: সূরা (২) বাকারা: ১৪৩ আয়াত; সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত।

[9] দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৩১০-৩৪৪।

[10] সূরা ৫: মায়েদা, ১৫-১৬ আয়াত।

[11] দেখুন: সূরা : ৪২, শূরা, ৫২ আয়াত; সূরা ৭: আ'রাফ, ১৫৭ আয়াত।

[12] তাবারী, তাফসীর ৬/১৬১; কুরতুবী, তাফসীর ৬/১১৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/৩৫।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7204

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন